আহম্মেদ শরীফ

পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের সহযোগীদের গণহত্যার ধরন ও প্রকৃতি

মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা দেশে হত্যার কোনো নির্দিষ্ট ধরন ছিল না। পাকিস্তানিরা প্রথমে ট্যাঙ্ক ও মর্টারের গোলাবর্ষণ করে এবং মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করেছে এক একটি জনপদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে। বাড়ি থেকে ধরে এনে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে গুলি করে বা বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়েছে। গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। জ্যান্ত কবর দেওয়ার বহু ঘটনাও ঘটেছে। কখনও পশুর মতো জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে জীবন্ত মানুষের শরীরের মাংশ খণ্ড খণ্ড করে কেটে হত্যা করা হয়েছে। চট্টগ্রামে গ্যাস চেম্বারে বসিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কখনও শারীরিক নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। শেষোক্ত পদ্ধতি তারা সাধারণতঃ অনুসরণ করত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে। মুক্তিযোদ্ধাদের জিপের পেছনে বেঁধে প্রচণ্ড বেগে জিপ চালিয়ে হত্যা করারও বহু ঘটনা ঘটেছে। শাহরিয়ার কবির *একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার* গ্রন্থে ক্যাপ্টেন সুজাউদ্দিন আহমেদকে উদ্ধৃত করেন, "মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সন্দেহকারীদের গায়ে গ্রেনেড বেঁধে পিন খুলে তাদের পালাতে বলত পাকিস্তানিরা। হতভাগ্যরা দৌড়াতে গিয়ে কয়েক সেকেন্ডের ভেতর গ্রেনেড বিস্ফোরণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত। পাকিস্তানিরা এই দৃশ্য দেখে উল্লাস প্রকাশ করত।"[১] যাদের গুলি করে বা গ্রেনেড বিস্ফোরণের মাধ্যমে হত্যা করা হতো তারা মরে বেঁচে যেত। পাকিস্তানি বাহিনী যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করত তার মধ্যে সবচেয়ে নৃশংস ছিল নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা। বাঙালিদের হত্যার জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্যাতনের ভয়ঙ্কর পদ্ধতি যারা প্রত্যক্ষ করেছেন তারা বলেছেন, '৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন হিটলারের নাৎসি বাহিনীর বর্বরতার চেয়ে ঢের বেশি ভয়ঙ্কর ছিল।[২] বর্তমান প্রবন্ধে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের গণহত্যার কয়েকটি ধরন ও প্রকৃতি উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে।

শ্রমদাসের পরিণত করার পর গণহত্যা

বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমশক্তি হিসেবে পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরীহ মানুষকে কাজ করাতো। অন্তত শারীরিক গণহত্যার হাত থেকে বেশ কিছু দিন তাদের জীবন রক্ষা হতো।[৩] দেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনী জোর করে স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে এ ধরনের কাজ আদায় করে নিতো। পাকিস্তানি সৈন্যের পক্ষে শ্রমিক যোগার করা কঠিন হয়ে পরেছিল। তাই বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে শ্রমিকদের কাজ করাতো। সাধারণ মানুষ কখনও বাধ্য হয়ে, কখনওবা প্রলুব্ধ হয়ে তাদের হয়ে শ্রম দিতো। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদের স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে শ্রমিকদের হত্যা করত। যেমন : সিলেটের লালমাটিয়ায় পাকিস্তানি বাহিনী মাঠে কাজ করতে আসা স্থানীয় লোকদের ধরে এনে গর্ত খুঁড়ে নিতো এবং গর্তের মধ্য নিরীহ লোকজনকে হত্যার পর আবার তাদের দ্বারা গর্ত ভরেও নিতো। লালমাটিয়া গণহত্যার পর লাল মিয়া দ্বারা এই রকম কাজ করে নেয় বলে তিনি জানান।[৪] নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে বিমান বন্দর তৈরি কাজের জন্য শত শত মানুষকে ধরে নিয়ে এসে কাজ করিয়ে নেয়।[৫] কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার পর তাদের গণহত্যার শিকার হতে হয়।

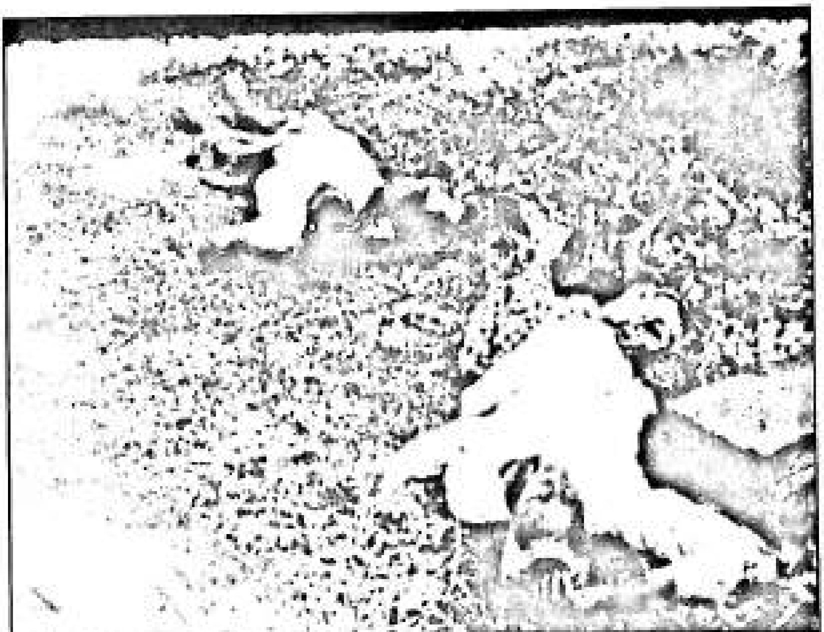

১৯৭১ সালের গণহত্যায় রাস্তার পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাশ; সংগৃহীত

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা করে গণহত্যা

ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী দেশব্যাপী হামলা করলেও তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি কোনো ধর্মের মানুষই। ধর্ম প্রাণ মানুষ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সারাদেশে তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। সারাদেশে এরকম অনেক দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণ : নাটোর সদর উপজেলার বনবেলঘরিয়ার মসজিদ থেকে টেনে বের করে হত্যা করা হয় ১০৫ বছর বয়সের আওয়ামী লীগ সমর্থক বৃদ্ধ সৈয়দ আলী মুন্সিকে। আব্দুস সালাম সরকার নামক একজন ফতেঙ্গাপাড়া গণহত্যায় শহিদ হন, তাঁর বুকের ওপর কুরআন শরীফ পেয়েছিল স্থানীয় জনগণ।[৬] চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার সালামপুর গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনী মসজিদের ভিতর দুইজন নামাজীকে গুলি করে হত্যা করে।[৭] ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার পুলিশ লাইন গণহত্যার পূর্বে ঐ এলাকার মাদ্রাসায় থাকা কুরআন শরীফসহ অন্যান্য জিনিসপত্র পুঁড়ে দেয়।[৮] পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারী উপজেলার কুরআন হাফেজ আসিরুল্লাহকে পাকিস্তানি বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। একই জেলার সদর উপজেলা দুইপাড়া মাদ্রাসায় আশ্রয় নেওয়া মানুষদের টেনে হিঁচড়ে বের করে হত্যা করা হয়।[৯] কিংবা লালমনিরহাটের ভেলাবাড়ি ইউনিয়নের সাকোয়া জামে মসজিদের ভিতর ৬৪ জনকে আটকে রেখে পাকিস্তানি সৈন্যরা মসজিদের আগুন দেয়। সবাই সেখানে শহিদ হন। লালমিরহাটের কালিগঞ্জের কাকিনা ইউনিয়নে মসজিদের ইমামসহ ৫ জনকে মসজিদের মধ্যে ঢুকে হত্যা করে।[১০] অন্যধর্মের লোকজনতো পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া ছিল অলীক ঘটনা। বনপাড়া ক্যাথলিক মিশন থেকে লোকজন বের করে এনে ফতেঙ্গাপাড়া গণহত্যা সংঘটিত করে।[১১] বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার কাঠিরা গণহত্যা গির্জার মধ্যে সংঘটিত করা হয়।[১২] অসংখ্য হিন্দুদের মন্দিরের গণহত্যা সংঘটিত হয়। বগুড়া জেলার গাবতলীর কাগইল জমিদার বাড়ির সামনে কালিমন্দিরে গণহত্যা।[১৩] এই রকম সারাদেশে পাকিস্তানি বাহিনী বিভিন্ন ধর্মের লোককে হত্যা করে।

নিরাপত্তার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে গণহত্যা

পাকিস্তানি সৈন্য, বিহারি, রাজাকার, আলবদর, আলশামসসহ বিভিন্ন দল নিরীহ বাঙালিদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে নিজ বাসস্থানে থাকতে বলে, পরে পরিকল্পিতভাবে তাদের হত্যা করে। লালমনিরহাট নিউকলোনিতে বিহারি কমরউদ্দিনের আশ্বাসের তাদের দেখভাল করার কর্মচারীদের নিজের বাড়িতেই থেকে যান। কিন্তু তাদেরকে পরে পরিবার সমেত হত্যা করা হয়।[১৪]

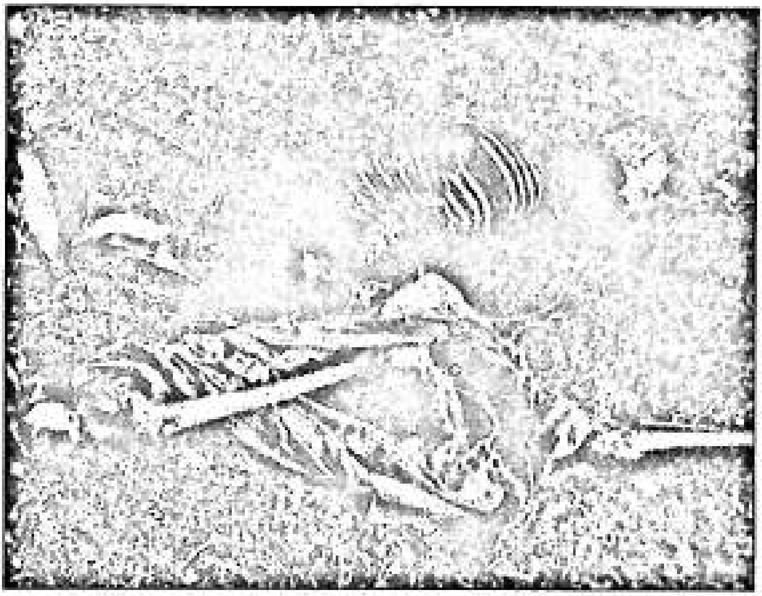

গণহত্যায় প্রাণ হারানো বাঙালির কঙ্কাল, ১৯৭১; সংগৃহীত

মুক্তিযোদ্ধা বা সংগঠকদের খোঁজ করতে গিয়ে গণহত্যা

পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের অনুসন্ধান করতে গিয়ে অনেক গণহত্যা সংঘটিত করে। তারা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সবসময় মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে থাকতো। তাই পাকিস্তানি বাহিনী তাদের সোর্স ও এদেশীয় দোসরদের খবরের ভিত্তিতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করত। মুক্তিযোদ্ধাদের ধরতে পারলে নির্মমভাবে তাদের হত্যা করত। কিন্তু অভিযানে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরতে না পারলে তাদের রোষে মুখোমুখি হতে হতো গ্রামবাসীকে। মুক্তিযোদ্ধাদের ধরতে না পারলে পরিবারের সদস্যদের কখনও ঐ স্থানেই হত্যা করত, কখনও তাদেরকে নির্যাতন কেন্দ্রে নিয়ে নির্মম অত্যাচারের পরে হত্যা করত। কয়েকটি উদাহরণ এখানে বর্ণনা করা হলো : ২০ অক্টোবর বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার নারচী ও গণকপাড়া গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মুখ যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের মুখে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এ সময় মুক্তিবাহিনীর খোঁজ না পেয়ে পাকিস্তানিরা নারচী ও গণকপাড়া গ্রামে ঢুকে কয়েকজন মানুষকে হত্যা করে। পরের দিন ২১ অক্টোবর পাকিস্তানি সেনারা আবার একই গ্রামে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে বেশকিছু গ্রামবাসিকে হত্যা করে এবং বহু বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়।[১৫]

২১ অক্টোবর বগুড়ার সারিয়াকান্দি থানার টিউরপাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল অবস্থান নেয়। পাকিস্তানি বাহিনী এই খবর পেয়ে টিউরপাড়ায় আক্রমণ করে। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভারী অস্ত্রের মুখে টিকতে না পাড়ায় মুক্তিযোদ্ধারা পিছু হটে যায়। এরপর ঐ দিন পাকিস্তানি সেনারা টিউরপাড়া গ্রামের ঢুকে অনেক নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে।[১৬]

মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজে বা মুক্তিবাহিনী কোথায় অবস্থান করছে কিংবা এদের পেছনে রয়েছে ভারতীয় বাহিনী আছে— এরকম একটি সংবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তানি বাহিনী হাতিয়ায় গণহত্যা চালায়। ১৩ নভেম্বর কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার হাতিয়া ইউনিয়নে একটি গণহত্যা সংঘটিত হয়।[১৭] এরকম গণহত্যা শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার ধানশাইল ইউনিয়নের জগৎপুরে সংঘটিত হয়।[১৮] মুক্তিযোদ্ধাদেরকে খুঁজতে গিয়ে খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলার দেয়াড়ায় একটি গণহত্যা সংঘটিত হয়।[১৯]

শুধু তাই নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার অপরাধে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা সারাদেশে সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলায় পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করার অপরাধে বিশ্বনাথপুরে একটি বড় গণহত্যা সংঘটিত করে।[২০]

বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিকামী জনতার ওপর আচমকা আক্রমণ চালাতে থাকে পাকিস্তানি বাহিনী। মুক্তিযোদ্ধাদের নিধনের নামে এ গণহত্যা সংঘটিত হয়। এরকমই একটি গণহত্যা হলো— বিনোদবাড়ি মানকোন গণহত্যা।

পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিবাহিনীর ওপর উল্টো আক্রমণ করতে গিয়ে কৃষ্ণপুর-ধনঞ্জয়ে ১১ সেপ্টেম্বর এ গণহত্যা সংঘটিত হয়।[২১]

শরণার্থীদের গণহত্যা

পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসররা সারাদেশে বিচিত্রভাবে গণহত্যা করে। নিরাপদ আশ্রয়ের অনুসন্ধানের যাওয়ার পথে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের হাতে গণহত্যার শিকার হয় অনেকে। এ ধরনের গণহত্যার সবথেকে বড় উদাহরণ চুকনগর। খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার চুকনগরে ২০ মে শরণার্থীদের ওপর নৃশংস আক্রমণ করে প্রায় ১০,০০০ জন নারী-পুরুষকে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী।[২২] নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলায় ২৭ এপ্রিল মঙ্গলবার সকাল ১১টায় নিরাপদ আশ্রয়ের

খোঁজে যাওয়ার পথে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে কালিগঞ্জে ৩০০ জনের বেশি মানুষ গণহত্যার শিকার হন।[২৩]

বাঙালি শরণার্থী। ফটোগ্রাফার রেমন্ড ডিপারডন। নভেম্বর, ১৯৭১।

প্রতারণার মাধ্যমে গণহত্যা

দেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনী অর্থের বিনিময়ে বন্দিদের ছেড়ে দিতো। তাই যাদের অর্থ-বিত্ত ছিল তারা চেষ্টা করত অর্থের বিনিময়ে জীবন বাঁচানোর জন্য। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় রাজাকাররা স্থানীয়দের কাছ থেকে অর্থ নিচ্ছে কিন্তু তাদেরকে আবার হত্যাও করা হচ্ছে। কারণ পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে অর্থ না পৌঁছিয়ে রাজাকাররা আত্মসাৎ করেন। ১৩ অক্টোবর বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটের লকপুর ইউনিয়নের ভট্টখামার গ্রামের নিরঞ্জন দাসের বিধবা স্ত্রী বিজনবালা দাস তার সঞ্চিত ২৬০০ টাকা রাজাকারদের হাতে দেন পরিবারের সদস্যদের জীবন বাঁচানোর জন্য কিন্তু পরিবারের তিনজনকে রাজাকাররা বেঁধে গুলি করে হত্যা করে।[২৪]

প্রতারণার সহায়তা নিয়ে এরকম অনেক হত্যা ও গণহত্যা সংঘটিত করা হয়েছে। নাটোরের কাপুড়িয়াপট্টির বাসিন্দা ডা. বলাই চন্দ্র বসাককে কয়েকজন মহিলা তাদের সাথে নিতে আসে এই বলে যে একজন মহিলার বাচ্চা হবে। ডা. বলাই চন্দ্র বসাককে সাথে করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়।[২৫]

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার গোলাহাট নামক স্থানে এরকম একটি গণহত্যা সংঘটিত হয়। সৈয়দপুরের মারোয়ারিপট্টি ও

অন্যান্য এলাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ যাদের পাকিস্তানি বাহিনী বিমান বন্দর তৈরি কাজে লাগিয়েছিল, তাদেরকে নিরাপদে ভারত পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ট্রেনে উঠায় এবং গোলাহাট নামক স্থানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।[২৬] স্থানীয় রাজাকাররা গ্রামবাসীকে অভয় দেয় পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করবে না। তাদের কথায় বিশ্বাস করে গ্রাম ত্যাগ না করায় তাদেরকে জীবন দিতে হয়। ১৩ এপ্রিল এ ধরনের একটি গণহত্যা চট্টগ্রাম জেলার রাউজান পৌরসভার জগতমল্লপাড়ায় সংঘটিত হয়।[২৭]

আশ্রিতদের গণহত্যা

দেশের মধ্যেই তুলনামূলক দুর্গম এলাকায় নিরীহ মানুষজন জীবন রক্ষার জন্য আশ্রয় নিতো। এই আশ্রয়স্থলগুলোতে পাকিস্তানি বাহিনীকে লেলিয়ে দিতো তাদের দোসর ও রাজাকাররা। এরকম অসংখ্য উদাহরণের একটি রংপুর জেলার ঝাড়ুয়ার বিল গণহত্যা। বিহারিদের সাথে পার্বতীপুর, সৈয়দপুর ও রংপুরে বাঙালিদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বাঙালিরা ঐ এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ বিহারিদের কাছে ছিল অসহায়। বাঙালিদের সহায়-সম্পত্তি তারা লুট করতে থাকে। ফলে শহর ছেড়ে তাদের অনেকে রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার ঝাড়ুয়ার বিল অঞ্চলে আশ্রয় নেয়।[২৮] ১৭ এপ্রিল

গণহত্যার শিকার বাঙালি, ১৯৭১; সংগৃহীত

রংপুর সেনানিবাস থেকে প্রায় ৩০০ পাকিস্তানি সৈন্যবাহী একটি ট্রেন এবং আরেকটি ট্রেন পার্বতীপুর থেকে করতোয়া ব্রিজ পার হয়ে বালাপাড়া রেলগেটে থামে। এই ট্রেনে ছিল পাঞ্জাবি ও এদেশী দোসর মিলে পাকিস্তানিদের অনুসারী প্রায় ২০০ জন। সাথে কিছু পাকিস্তানি সৈন্যও ছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা আশপাশের সব এলাকা যেমন : ঝাড়ুয়ার বিল, রামকৃষ্ণপুর, ঘাটাবিল, কৃষ্ণঘাটাবিল, বুজরুক বাগবাড়, হাজীপুর, খালিশা হাজীপুর, রামনাথপুর, খোর্দ বাগবাড় এলাকা ঘিরে ফেলে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। এরপর বেলা প্রায় ২টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এ গণহত্যা। ঝাড়ুয়ার বিল গণহত্যার শিকার ৩৬৭ জন শহিদের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এই গণহত্যায় শহিদ হয়েছেন ১৫০০ জনের বেশি মানুষ।[২৯]

১১ এপ্রিল রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গণহত্যা চালায় বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া পৌরসভার চৌধুরীপাড়ার ঐতিহ্যবাহী চৌধুরীবাড়িতে।[৩০] মন্মথ চন্দ্র কুণ্ডু ও তার পরিবারের ৮-৯ জন সদস্যসহ বগুড়া শহর থেকে দুপচাঁচিয়ার কুণ্ডুপাড়ার ক্ষিতিশ চন্দ্র চৌধুরি বাড়িতে আশ্রয় নেয়। স্থানীয় অবাঙালিরা সেই খবর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছে পৌঁছে দেয়। পাকিস্তানি বাহিনী ওই রাতে জমিদার বাড়িতে আক্রমণ করে। ওই বাড়িতে সবাইকে পুকুরপাড়ে একত্র করে নারীদের ওপর নির্যাতন করে এবং সবাইকে হত্যা করে।[৩১]

দুর্গম এলাকায় নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আশ্রয় নিতো। কিন্তু স্থানীয় রাজাকাররা জনগোষ্ঠীর আশ্রয়ের খবর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে জানিয়ে দিতো। ফলে পাকিস্তানি বাহিনী সেখানে গিয়ে গণহত্যা সংঘটিত করত। এরকম একটি গণহত্যা ১৭ মে সংঘটিত হয় ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার শুক্তাগড় ইউনিয়নে কাঠিপাড়ায়,[৩২] ইত্যাদি।

আত্মরক্ষার্থে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য শরণার্থী হিসেবে যারা দেশত্যাগ করছিলেন, তাদের ওপর রাজাকাররা ও পাকিস্তানি বাহিনী বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করে গণহত্যা সংঘটিত করে। বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার ডাকরা নামক স্থানে শরণার্থী হিসেবে যাওয়ার সময় ২১ মে রাজাকাররা একটি গণহত্যা সংঘটিত করে।[৩৩] এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে। কালিগঞ্জ গণহত্যা,[৩৪] চুকনগর গণহত্যা,[৩৫] বাদামতলা গণহত্যা,[৩৬] বেলতলী গণহত্যা[৩৭] ইত্যাদি।

নিয়মিত টহলের সময় গণহত্যা

পাকিস্তানি বাহিনী নিয়মিত টহল দিতে গিয়ে অনেক গণহত্যা সংঘটিত করে। প্রায় প্রতিটি উপজেলা সদরে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প ছিল। ক্যাম্পগুলো থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা নিয়মিয় টহলে বের হতো কিংবা তাদের দোসর রাজাকারদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হানা দিতো। এই রকম নিয়মিত টহল দিতে গিয়ে অনেক গণহত্যা সংঘটিত করে।

উদাহরণ: পাকিস্তানি বাহিনী বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় টহল দিতে গিয়ে গণহত্যা সংঘটিত করে। ৭ মে পাকিস্তানি বাহিনী বগুড়ার কাহালু থানার গিরাইল গ্রামে টহল দিতে গ্রামে অনেক মানুষকে হত্যা করে।[৩৮] গিরাইল গ্রাম হত্যার পর পাকিস্তানি বাহিনী নশিরপাড়ায় গিয়ে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এরপর বিবিরপুরের দিকে গিয়ে সেখানেও গণহত্যা চালায়।[৩৯] একই দিনে জয়তুল গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা সংঘটিত করে।[৪০]এই রকম সারাদেশে পাকিস্তানি বাহিনী টহল দিতে গিয়ে অসংখ্য গণহত্যা সংঘটিত করে।

নদীতে ভেসে যাওয়া শহিদের লাশ; সংগৃহীত

কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা প্রতিশোধমূলক গণহত্যা

পাকিস্তানি বাহিনী প্রথমেই দেশব্যাপী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য গণহত্যা শুরু করে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় সংগঠকদের দ্বারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা ও গেরিলা যোদ্ধাদের দ্বারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এবং তারা ক্ষুব্ধ হয়ে পাড়ায়-মহল্লায় গণহত্যা সংঘটিত করে।

একাত্তরের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের নির্দেশনা অনুসারে পূর্ব বাংলার অন্যান্য স্থানের মত সৈয়দপুরেও সর্বাত্মক প্রতিরোধের প্রস্তুতি শুরু হয়। এর বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নেয় অবাঙালি অধ্যুষিত সৈয়দপুর শহরের বিহারিরা এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহায়তায় তারা সৈয়দপুর শহরবাসীকে অবরুদ্ধ করে ও নিরীহ বাঙালিদের ওপর হামলা চালায়। খবর পেয়ে ২৪ মার্চ অবরুদ্ধ সৈয়দপুরবাসীকে উদ্ধারে ছুটে আসেন দিনাজপুর চিরিরবন্দর উপজেলার সাতনালা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাহতাব বেগের নেতৃত্বে কয়েক হাজার মুক্তিকামী মানুষ। তারা এগিয়ে আসেন সৈয়দপুরে বাঙালি জনতার কাতারে সামিল হওয়ার জন্য। এ সময় পাকিস্তানি সেনাদের বুলেটের আঘাতে নির্মমভাবে নিহত হন মাহতাব বেগসহ অনেক মানুষ। তখন মাহাতাব বেগের মৃতদেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে হাতে নিয়ে উল্লাসও করেছিল অবাঙালি বিহারিরা।[৪১]এরকম একটি গণহত্যা পাকিস্তানি বাহিনী দিনাজপুরে নিজেদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ১০ অক্টোবর চড়ারহাটে সংঘটিত করে।[৪২]

বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের হামলায় নাস্তানাবুদ হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে পাকিস্তানি বাহিনী অনেক গণহত্যা সংঘটিত করে। দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার বিজোড়া ইউনিয়নের বহলায় এরকম একটি গণহত্যা সংঘটিত হয়।[৪৩]

পাকিস্তানি বাহিনী দিনাজপুরে নিজেদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নবাবগঞ্জ উপজেলার চড়ারহাটে ১০ অক্টোবর গণহত্যা সংঘটিত করে।[৪৪] দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার শহরগ্রাম ইউনিয়নে ৫ জৈষ্ঠ্য পশ্চিম রাজারামপুরে একই কারণে আরও একটি গণহত্যা সংঘটিত হয়।[৪৫]

পাকিস্তানি বাহিনী নিজেদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক গণহত্যা সংঘটিত করে। আরও একটি উদাহরণ : লালমাটিয়া, জৈনপুর ও খাজাঞ্চি বাড়িতে গণহত্যা।

যুদ্ধে আইনের বহির্ভূত গণহত্যা

সাধারণত যুদ্ধে আইনে যেসব স্থান আক্রমণের বাইরে থাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো হাসপাতাল। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সৈন্যরা হাসপাতালে আক্রমণ করতে থাকে। উদাহরণ: লালমনিরহাট রেলওয়ে হাসপাতাল গণহত্যা। এই হাসপাতালে ডাক্তার, স্টাফসহ সকল রোগীকে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করে।[৪৬] নাটোর সদরের রাজাকাররা হাসপাতালের সবাইকে আশ্বাস দিয়েছিলেন চিকিৎসার সাথে যুক্তদের কোনো ক্ষতি হবে না। নাটোর

সদর হাসপাতালের রোগীদের এবং তার সাথে কর্মচারী জীবনকৃষ্ণ মানিকে হত্যা করে হানাদার বাহিনী।[৪৭] কুমিল্লা পুলিশ লাইন হাসপাতালেও গণহত্যা সংঘটিত করে।[৪৮]এর মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনী যে ঘৃণ্য কাজ করে তা বর্বর ছাড়া কারও পক্ষে সম্ভব ছিল।

গণহত্যার ধরন

১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট এবং গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত ৭৪টি *গণহত্যা নির্ঘণ্ট*কে উৎস হিসেবে ধরে গণহত্যার ধরন সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে—

গণহত্যার ধরন[৪৯]

ধরন	সংখ্যা
শরণার্থীদের গণহত্যা	০৬
প্রতারণার মাধ্যমে গণহত্যা	০৩
আশ্রিতদের হত্যা	০২
মুক্তিযোদ্ধা বা সংগঠকদের খোঁজ করতে গিয়ে গণহত্যা	১২
নিয়মিত গণহত্যা	১১
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা প্রতিশোধমূলক নিতে গণহত্যা	২০
সাম্প্রদায়িক গণহত্যা	১৪
অন্যান্য গণহত্যা	০৬
মোট	= ৭৪টি

ছকে উল্লিখিত প্রথম তিন ধরনের গণহত্যা মূলত শরণার্থীদের ওপর হয়েছে। নিরীহ মানুষজন জীবন বাঁচানোর চেষ্টার অংশ হিসেবে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যখন যাচ্ছিল, তখন তাদের ওপর হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে গ্রামবাসীদের পাকিস্তানি বাহিনীর দোসররা আশ্বস্ত করে বলে তাদের ওপর কোনো ধরনের হামলা চালানো হবে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা পাকিস্তানি বাহিনীকে সাথে নিয়ে এসে গণহত্যা সংঘটিত করে। এই ভাবে প্রতারণার মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা গণহত্যা সংঘটিত করে। এছাড়াও প্রতারণার বিচিত্র ধরন ছিল। দুর্গম এলাকায় যেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে পৌছানো সম্ভব নয়, সাধারণ মানুষজন সেই জায়গাগুলোতে আশ্রয় নেন কিন্তু রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনী ঐ জায়গাগুলোতে গণহত্যা সংঘটিত করে। মুক্তিযোদ্ধার অনুসন্ধান করতে গিয়ে ও দেশব্যাপী ব্যাপক গণহত্যা হয়।

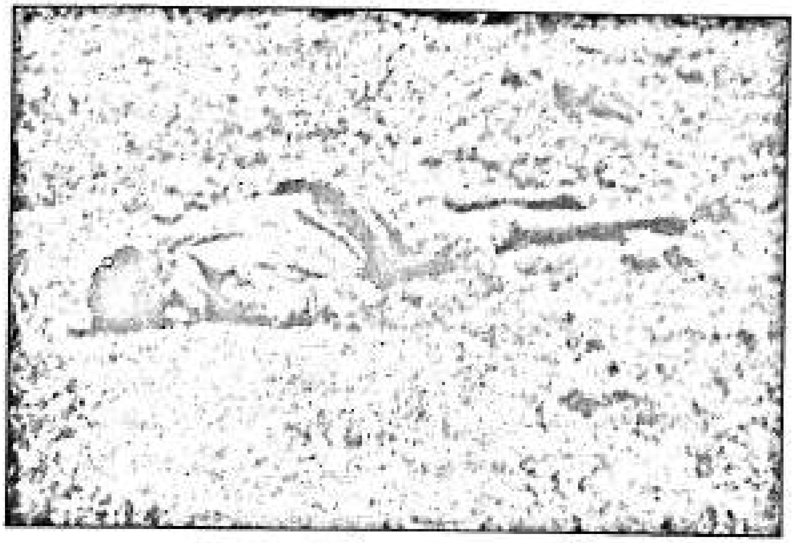

পড়ে আছে বাঙালির লাশ, ১৯৭১; সংগৃহীত

উপর্যুক্ত ধরন ছাড়াও অনেক ধরনের গণহত্যা মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি তুলে ধরা হলো :

১. কারাগার থেকে বন্দিদের নিয়ে গিয়ে গণহত্যা সংঘটন করা হতো। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর উপজেলার পৈরতলা ও কাউতলীতে এরকম গণহত্যা সংঘটিত হয়।[৫০]

২. পাকিস্তানি বাহিনী সারাদেশে নৃশংসভাবে হত্যা করতে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম কৌশল হলো পুড়িয়ে হত্যা করা। পাকিস্তানি বাহিনী সারাদেশে গ্রামাঞ্চলে ঘরে বন্দি করে সেই ঘরে আগুন দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এর অনেক উদাহরণ আছে। লালমনিরহাট সদর উপজেলার দরাকুটিতে একটি ঘরে ১৭ জনকে বন্দি রেখে আগুন দেওয়া হয়।[৫১] শহরাঞ্চলে বয়লারশপে ফেলে হত্যা করা হতো। বেশির ভাগ জেলা শহরেই এই ঘটনা দেখা যায়। উদাহরণ: লালমনিরহাট রেলওয়ে স্টেশনের বয়লারে পাকিস্তানি সৈন্যরা নয় মাসব্যাপী মানুষজনকে ধরে এনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।[৫২] শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি বাহিনী ও বিহারিরা ফাঁসি মঞ্চ তৈরি করে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে মৃতদেহ বয়লারে নিক্ষেপ করে পুড়ে ফেলত। উদাহরণ : গাইবান্ধা জেলার বোনারপাড়া লোকোশেড স্টিম ইঞ্জিনের বয়লারের জ্যান্ত মানুষ নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারা হতো।[৫৩] খুলনা প্লাটিনাম জুট মিলের

জ্বলন্ত বয়লারের ভিতরে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় অনেক মানুষকে।[৫৪] রেল ইঞ্জিনের জ্বলন্ত বয়লারে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হতো। দিনাজপুরের পার্বতীপুরে বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজনকে একত্র করে, রাতে নয়টি বড় রেলের ইঞ্জিনের জ্বলন্ত বয়লারে নিক্ষেপ করা হতো বাঙালিদের।[৫৫] পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগীরা ইটভাটায় পুড়িয়েও বাঙালিদের হত্যা করত। উদাহরণ: নসুরখানের ইটভাটা গণহত্যা, খুলনা।[৫৬]

৩. পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকাররা নিরীহ মানুষকে হত্যা করে তাদের লাশগুলো ওপর খড়ের গাদা ছড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার দাউরা গ্রাম গণহত্যায় এরকম ঘটনা ঘটে।[৫৭]

৪. চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় কাঁথা দিয়ে মুড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে হত্যা করার ঘটনা ঘটে।

৫. দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার উচিৎপুর গণহত্যায় পাটের গাইডে আগুন লাগিয়ে ৫০ জনের বেশি শরণার্থীকে পুড়িয়ে হত্যা করে পাকিস্তানি সৈন্যরা।[৫৮]

৬. পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর কর্তৃত্ব নির্বিঘ্ন করার জন্যে আকাশ পথে নজরদারি ও হামলা পরিচালনা করত। এরকম হামলায় অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানি বাহিনী সারাদেশে শিক্ষাঙ্গন, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি সবকিছুই বোমা মেরে ধ্বংস করে দিতে। ২৬ মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার লালমাই পাহাড় দখল করে গাছপালা কেটে এবং বিমানের মাধ্যমে গোলাবর্ষণের মাধ্যমে অরাজকতা ও গণহত্যা সংঘটিত করে।[৫৯] কুমিল্লার লাকসামেও এরকম আক্রমণ চালানো হয়।[৬০] চট্টগ্রাম শহরের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র ও এর আশেপাশে ২৬ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনী বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করে এবং স্থল বাহিনী কর্তৃক বেতার কেন্দ্র দখলের সময় বহু মানুষকে হত্যা করে। পাকিস্তানি বিমান বাহিনী কখনও স্থলবাহিনীকে কখনও বা অপ্রয়োজনে লোকালয়ে গোলাবর্ষণের মাধ্যমে অনেক মানুষকে হত্যা করে।

৭. পাকিস্তানি বাহিনী ভুল করে অনেক জায়গায় গণহত্যা সংঘটিত করে। তারা তথ্যের ভিত্তিতে কোনো জায়গায় বা স্থানে গণহত্যা করতে গিয়ে একই নামের অন্য জায়গায় স্থানে গণহত্যা সংঘটিত করে।

৮. তৃষ্ণার্ত নিরীহ মানুষজন যখন পানি খেতে না দিয়ে হত্যা করত।

৯. এসিড দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করে। উদাহরণ : নাটোর সদরের ছাতনী গণহত্যা পাকিস্তানি সৈন্যরা ৭৮ জন নিরীহ মানুষকে এসিড দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা হয়।[৬১] চট্টগ্রাম শহরের মহসিন কলেজ বধ্যভূমিতে মানুষকে হত্যার পর এসিড দিয়ে তাদের লাশ গলে দেওয়া হতো।[৬২]

১০. পাকিস্তানি বাহিনী হত্যার পর মৃত দেহের সাথে সিমেন্টের বস্তা বেঁধে নদীতে ফেলে দিতো যেন লাশ নদীতে ডুবে যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার শ্মশানঘাট গণহত্যায় ২১ এপ্রিল ১৯৭১ পাকিস্তানি বাহিনী আটককৃত বৃদ্ধদের নদীতে ফেলে দিয়ে হত্যা করে।[৬৩] দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার কাঁকড়া রেলব্রিজ গণহত্যায় শহিদদের পাকিস্তানি সৈন্যরা বস্তায় ভরে নদীতে ফেলে দিতো।[৬৪]

১১. নদী এলাকায় হত্যার করে পেট কেটে নদীতে ফেল দিতো যেন লাশ নদীতে ডুবে যায়।

১২. পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগীরা হত্যার পর নারী-পুরুষদের পেটে খুচিয়ে খুটিয়ে নাড়ীভুরি বের করে আনে।[৬৫]

১৩. পাট বেলিং প্রেসার যন্ত্র দিয়ে অনেকজনকে একসঙ্গে হত্যা করা হতো। নীলফামারী ডাকবাংলাতে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্পে পাট বেলিং প্রেসার যন্ত্র দিয়ে বন্দিদের ওপর অত্যাচার করা হতো। বেলিং যন্ত্রের মধ্যে কয়েকজন করে বন্দি তুলে চাপা দেওয়া হতো। এতে তাদের হাত পা এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের হাড় মট মট করে ভেঙ্গে নিহত হতেন।[৬৬]

১৪. পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের দোসরদের নির্যাতনে আহতদের জীবন্ত মাটিচাপা দিয়ে হত্যা করা হতো। উদাহরণ : বালারখাইল গণহত্যা, রংপুর।

১৫. জীবন্ত মানুষদের ধরে এনে গভীর কূপের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিতে হত্যা করা হতো। উদাহরণ : নীলফামারী কলেজে ম্যানেজমেন্ট বিভাগের পেছনের কূপ।

১৬. পাকিস্তানি সৈন্যরা শিশুদের বিভৎসভাবে হত্যা করত। শিশুদের দুই পা দুই জন সৈন্য দুই দিক থেকে টেনে ছিঁড়ে হত্যা করত। নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরের গোলাহাট গণহত্যা এই রকম উদাহরণ পাওয়া যায়।[৬৭] চট্টগ্রাম শহরের নাথপাড়া গণহত্যায় বনমালী নাথের ৮ বছরের কন্যা শিশু মিনুকে মায়ের কোল থেকে নিয়ে আছাড় মেরে হত্যা করেছে বিহারিরা।[৬৮] দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার পুরাতন বাজার গণহত্যায় রেল লাইনের ওপর আছাড়

দিয়ে ৬ বছরের শিশু আকরামকে হত্যা করে। ফলে, শিশুটির মাথার ঘিলু বের হয়ে যায়।[৬৯]

১৬. পশুর মতো জবাই করে হত্যা হতো।

১৭. বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার রামপাল ডাকবাংলো বধ্যভূমিতে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে মানুষকে জবাই করা হতো।[৭০]

১৮. চট্টগ্রাম শহরের শেরশাহ কলোনী বধ্যভূমিতে বাঙালিদের পাথর দিয়ে মাথা থেতলিয়ে হত্যা করা হতো।[৭১] পাথরের ওপর হাত রেখে লোহার হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতো। চট্টগ্রাম শহরের ইস্টার্ণ কেবলস বধ্যভূমিতে এভাবে নির্মমভাবে নির্যাতন করে বন্দিদের হত্যা করা হতো।[৭২]

১৯. শারীরিক নির্যাতন করে হত্যা করা হতো। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো।

২০. পাকিস্তানি বাহিনী শরীর থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে প্রচুর রক্ত বের করে নিতো। ফলে রক্ত শূন্যতায় ঐখানেই মৃত্যুবরণ করত। মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার বাউশি ক্যাম্পে ভবেরচরের ইদ্রিস আলীকে এই নির্মম শাস্তি দেওয়া হয়। কারণ তিনি ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরে আসেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য।[৭৩]

২১. জীপের পেছনে বেঁধে সারা শহর ঘুরিয়ে হত্যা করা হতো। বিশেষ করে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য এ ধরনের হত্যা করা হতো।

২২. দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার ফুটকিবাড়ি গণহত্যায় কংশরা গ্রাম থেকে ধরে আনা আব্দুস সাত্তারকে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রেখে না খেতে দিয়ে গরম পানি ও ভাতের মাড় ফেলে হত্যা করেছে।[৭৪]

২৩. দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার ফুটকিবাড়ি গণহত্যায় টেনা গ্রামের আজিজুর রহমান (টুনিয়া মাস্টার)কে ধরে নিয়ে গিয়ে কাঁসার থালা আগুনে গরম করে বুক ও পিঠে ছ্যাঁকা দিয়ে অমানবিক নির্যাতন করে হত্যা করে।[৭৫]

২৪. দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার দেবীপুর গণহত্যার পূর্বে নারীদের ধর্ষণ করে, তাদের স্তন কেটে গাছে পেরেক মেরে আটকে রাখতো। আবুল কাশেমের মেয়ে রাহেনা খাতুনকে পিতার সামনে ধর্ষণ করে স্তন দুটো কেটে গাছে পেরেক মেরে ঝুলে রাখে।[৭৬]

২৫. ঠাকুরগাঁও জেলা সদরে অবস্থিত ইপিআর ক্যাম্পে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদেরকে বাঘের খাঁচায় ঢুকিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন করে বাঘের আহারে পরিণত করে। মুক্তিযোদ্ধা সালাহ্উদ্দিনকে বাঘের খাঁচায় ছুড়ে

ফেলা হলে হিংস্র বাঘ তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে দেহ ছিন্নভিন্ন করে হত্যা করে।[৭৭] একই রকম ঘটনা পঞ্চগর ও জয়পুরহাটেও ঘটানো হয়।

২৬. পাকিস্তানি বাহিনী তাদের সহযোগীদের গণহত্যার জন্য আর্থিক প্রণোদনা দিতো। চট্টগ্রামের ফয়েসলেক পশু খামার নির্যাতন কেন্দ্রে এধরনের গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে হত্যার জন্য অর্থের তারতম্য থাকতো। জবাই করে হত্যা করলে ২০ টাকা, গুলি করে হত্যা করলে ১০ টাকা এবং শরীর চিরে লবন-মরিচ দিয়ে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করলে ২৫ টাকা দেওয়া হতো।[৭৮] চট্টগ্রামের উত্তর কাট্টলী গোল্ডেন বেঙ্গল টোবাকো বধ্যভূমিতে প্রতিটি হত্যার জন্য পাকিস্তানি সৈন্যরা ৩০ টাকা করে প্রদান করতো।[৭৯] দিনাজপুর জেলার কোতয়ালি থানা নির্যাতন কেন্দ্রে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙালি হত্যার নতুন কৌশল নিয়েছিল। সেটা হলো, 'মুক্তিকামী বাঙালির মাথা'। এজন্য একটা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন জনের মাথার মূল্যায়ন করে বিভিন্ন দাম ধার্য করা হয়েছিল। দখলদার বাহিনীর হাতে নামের তালিকা ছিল কিন্তু কাউকে চিনত না। তাই মাথা পেলেই টাকা দিয়ে দিতো। এই সুযোগটা নিয়েছিল অবাঙালি বিহারি সম্প্রদায় ও রাজাকাররা। মাথার জন্য এরা পল্লীতে পল্লীতে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে এবং নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার মাথা বলে চালায়।[৮০]

২৭. ইলেকট্রিক শক দিয়ে গণহত্যা।

২৮. অর্ধমৃতের পর বিষাক্ত-পিপড়ে ছড়িয়ে দিয়ে হত্যা করা হতো।[৮১]

গণহত্যার এই পদ্ধতিগুলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অনুসরণ করে দেশের প্রায় সকল স্থানে। এই ধরনের ব্যাপক গণহত্যা সারা দেশে চলেছিল ৭১-এর পুরো নয় মাস।

মুক্তিযুদ্ধে যারা গণহত্যার শিকার হয়েছেন তাদেরকে বেশকয়েকটি শ্রেণি দেখানো যায়—

১. সাধারণ মানুষকে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এই শ্রেণির শহিদের রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি বাহিনী তুলে নিয়ে হত্যা করত। কখনও কখনও পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজাকারদের সাথে গিয়ে মানুষদেরকে তুলে এনে হত্যা করত।

২. মুক্তিযোদ্ধারা মৃত্যুকে হাতে করে যুদ্ধে গিয়েছিল। কারণ তারা অনেকটা খালি হাতে একটি প্রশিক্ষিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তাই এটাকে স্বেচ্ছা মৃত্যুবরণ বলা যায়।[৮২]

৩. যুদ্ধে শহিদ

৪. পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে। বিশেষ করে লঞ্চ, গান বোট, নৌকা প্রভৃতিতে করে ধরে নিয়ে গিয়ে নদীর মধ্যে হত্যা করে ফেলে দেয় হয়।

৫. মহামারীতে শহিদ— কলেরিয়া, ডায়রিয়া ও চোখ ওঠা ইত্যাদি ভিন্ন আঙ্গিকে মৃত্যুকে গণহত্যার মধ্যে বিবেচনা করা হবে। যুদ্ধাবস্থার ফলে দেশের মধ্যে কলেরা এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই অবস্থা নিয়েও পাকিস্তানি সৈন্যের হাত থেকে জীবন বাঁচাতে জুনের প্রথম পর্যন্ত পাঁচ মিলিয়নের বেশি শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেন।[৮৩] James Foster-এর একটি রিপোর্টের শিরোনাম ছিল, '600,000 of 5 million Refugees Have died.'।[৮৪] জুন মাসের মধ্যেই শরণার্থী শিবিরে যদি এত মানুষ মারা গিয়ে থাকে তা হলে নয় মাসে বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে কত মানুষ মৃত্যুবরণ করে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

গণহত্যার যত কারণ, দর্শন বা উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাক না কেন, তা মোটেই নির্ভুল নয়। তারপরেও গণহত্যার কারণসমূহ পর্যালোচনা করে এটা বলা যায়, পাকিস্তানি সৈন্য ও বাঙালিদের মধ্যে সম্ভাব্য একমাত্র সম্পর্ক হলো জাতিবিদ্বেষের সূত্রে প্রযুক্ত গণহত্যার সম্পর্ক। এটাই একমাত্র সম্পর্ক, অনেকটা 'ধরো আর মারো' গোছের।[৮৫] এত কিছুর মাঝেও ঘুষের বিনিময়ে পাকিস্তানি সৈন্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। বুরুঙ্গ গ্রাম গণহত্যা, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এরকম একটি উদাহরণ। বুরঙ্গা গ্রামের নিগুরবাসী দাস পাকিস্তানি সৈন্যদের বলেন তাদের বাড়িতে প্রচুর টাকা ও সোনার গহনা আছে। তাকে অর্থের বিনিময়ে সেগুলো আনার সুযোগ দেয় পাকিস্তানি সৈন্যরা।[৮৬] তিনি অর্থের বিনিময়ে বেঁচে যান। সারাদেশে এরকম ঘটনা ঘটে। সুতরাং একথা বলাই যায় পাকিস্তানিদের গণহত্যা ছিল মূলত নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। অন্য কোনো ব্যাখ্যার খুব বেশি প্রয়োজন নেই।

পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ

বাংলাদেশের গণহত্যার বৈশিষ্ট্য বিচিত্র। এত দিন যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা জানতাম সেগুলোর সাথে আরও কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

১. পাকিস্তানপন্থী শান্তিবাহিনী ও রাজাকার বাহিনীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী অনেক গণহত্যা সংঘটিত হয়। উদাহরণ : বাগেরহাট জেলার মংলা উপজেলার সুন্দরবন ইউনিয়নের দামেরখণ্ড গ্রাম গণহত্যা, চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার খরনা ইউনিয়নের মুজাফরাবাদে গণহত্যা।

২. বিহারী সম্প্রদায় পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী হিসেবে অনেকে গণহত্যা সংঘটিত করে। উদাহরণ : কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার রেলওয়ে জংশন নিকটবর্তী বেলতলীতে গণহত্যা,[৮৭] সৈয়দপুরের বাশবাড়ি গণহত্যা, [৮৮] *পাহাড়তলী গণহত্যা*, চট্টগ্রাম[৮৯] ইত্যাদি।

৩. রেল ও সড়কপথে আগত যাত্রীদের ধরে এনে অত্যাচার-নির্যাতন পূর্বক বিভিন্ন স্থানে হত্যা করে মাটিচাপা দেয়া হতো। উদাহরণ : কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার রেলওয়ে জংশন সন্নিহিত বেলতলীতে গণহত্যা।[৯০]

৪. বাঙালিকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব শূন্য করা উদ্দেশ্যে গণহত্যা সংঘটিত করা হয়। নীলফামারীর সৈয়দপুর থেকে রাজনৈতিক নেতাদের ধরে নিয়ে রংপুর জেলার সদর উপজেলার চন্দনপাট ইউনিয়নের বালারখাইলে এরকম একটি গণহত্যা সংঘটিত হয়।[৯১]

৫. বিভিন্ন মহানগর, বিভাগ, জেলায় বাঙালি পথচারী ও অফিস যাত্রীদের ধরে নিয়ে গিয়ে গণহত্যা করা হয়। মিরপুর ও মোহাম্মদপুর এলাকায় মানুষজনকে বিহারিরা কল্যাণপুর নিয়ে যায় এবং হত্যা করে।[৯২]

৬. পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়মিত গণহত্যা সংঘটিত হতো। যেখানে প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকার মানুষকে নিয়ে এসে হত্যা করা হতো। চাঁদপুর জেলা সদরের বড় রেলস্টেশন ছিল এরকমই একটি স্থান।[৯৩]

৭. শান্তি কমিটির মিটিংয়ের কথা বলে দেশের অনেক জায়গায় মানুষজনকে একজায়গায় করে হত্যা করত। চিক্লী ব্রিজ গণহত্যা, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

৮. পাকিস্তানি বাহিনী হিন্দুদেরকে গণহত্যার জন্য টার্গেট করেছিল আদর্শ বা উগ্র জাতীয়তাবাদের অংশ হিসেবে। অপর দিকে রাজাকাররা মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পদ ও অর্থের জন্য তাদেরকে গণহত্যার জন্য পাকিস্তানি বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়।

৯. ফাঁসি দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী অনেক জায়গায় হত্যা করত। বেলতলী গণহত্যায় যে দড়ি দিয়ে ফাঁসি দেওয়া হয় তা মুক্তিযুদ্ধের পর ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।[৯৪] চট্টগ্রাম শহরের উত্তর কাট্টলী গোল্ডেন বেঙ্গল টোবাকো বধ্যভূমিতে বন্দিদের গলায় দড়ি লাগিয়ে দুইজন দুই দিক থেকে টেনে হত্যা করত।[৯৫]

১০. স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তৈরির অভিযোগে বিভিন্ন বাজারে গণহত্যা সংঘটিত হয়।[৯৬] নিজবাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করায় দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার পুরাতন বাজার ভাস্করপট্টির রহিমুদ্দিন, পিতা : মসিজউদ্দিনকে বিহারিরা ধরে নিয়ে ভিলাই রেলব্রিজ বধ্যভূমিতে হত্যা করে।[৯৭] বিভিন্ন জেলা, উপজেলা, থানা ও ইউনিয়নের যারা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন, তাদের পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা করে। নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলায় পতাকা উত্তোলনের দায়ে হত্যা করা হয়— ছাত্র নেতা নূর ও কুদরতকে।[৯৮]

১১. চট্টগ্রাম শহরের ইস্টার্ন কেবলস বধ্যভূমিতে স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার অভিযোগে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলায় ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য গণহত্যা সংঘটিত হয়।[৯৯] স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার অপরাধে মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার তালতলা ক্যাম্প গণহত্যায় উত্তর কুসুমপুর গ্রামের শেখ লোহন মিয়াকে হত্যা করা হয়।[১০০]

১২. 'জয় বাংলা' স্লোগানের প্রতি পাকিস্তানি বাহিনীর ছিল ব্যাপক ক্ষোভ। দিনাজপুর সদরের টেলিফোন ভবন গণহত্যার একটি বিবরণ থেকে তা আরও স্পষ্ট হওয়া যায়। পাকিস্তানি সেনারা ও তাদের সমর্থিত দোসররা এই গণহত্যায় শিশুদের ওপরের দিকে ছুড়ে বেয়নেট দিয়ে গেঁথে চিৎকার করে বলতো, 'এ হি হায় জয় বাংলা'।[১০১]

১৩. দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার রাণীযোগী গণহত্যায় চৈত্রসংক্রান্তির দিন আব্দুলপুর ইউনিয়নে অধিকারীপাড়ার ভুবনেশ্বর অধিকারী নামে একজন আওয়ামী লীগ সংগঠককে নির্যাতন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 'ছয় টুকরো' করে আলাদা করে স্থানীয় অন্যান্য বন্দিদের দেখান। ছয় দফাকে ব্যঙ্গ করার জন্যই এটা করে পাকিস্তানি সৈন্যরা।[১০২] দিনাজপুর জেলার পাবর্তীপুর রেলস্টেশন গণহত্যায় হাবড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সরদার আব্দুল হাকিমকে নির্যাতনের পর শরীরের ছটি অঙ্গ কেটে স্থানীয়দের বলেছিল, 'এই নাও ছয় দফা'। এছাড়া ডা. শামসাদের কাঁধ থেকে দু'হাত এবং শরীরের কয়েকটি অঙ্গ টুকরো করে বয়লারের আগুনে ফেলে দেয়।[১০৩]

১৪. কোথাও গুলির খোসা দেখলে ওই এলাকার মানুষের আর রক্ষা থাকতো না। মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজে ব্যাপকহারে গণহত্যা সংঘটিত করত।[১০৪]

১৫. অনেক জায়গায় বিমান থেকে ছত্রি সেনা নামিয়ে গণহত্যা সংঘটিত করা হয়। বরিশাল সদর উপজেলার তালতলী বড় হাওলাদার বাড়ি গণহত্যায় এরকম ঘটনা ঘটে।

১৬. বন্দিদের সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে পেছন থেকে এলোপাতাড়ি গুলি করে গণহত্যা সংঘটিত করা হয় অনেক স্থানে। বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার থানার সামনে নদীর পাড়ে এরকম গণহত্যা সংঘটিত হয়।[১০৫]

১৭. ব্রিজের রেলিংয়ে ঝুলিয়ে রেখে নির্যাতনের পর গুলি করে হত্যা করা হতো। এরকম গণহত্যা সংঘটিত হয় মৌলভীবাজার জেলা সদরের চাঁদনী ঘাটে মনু ব্রিজে।[১০৬]

১৮. পূর্ব পাকিস্তানের নিকটতম প্রতিবেশি রাষ্ট্র হলো ভারত। ভারতীয় পণ্য পূর্ব পাকিস্তানে ছিল সহজলভ্য। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর হঠাৎ করে পাকিস্তানি সৈন্যরা ভারতীয় পণ্য ব্যবহারের দায়ে অনেক মানুষকে হত্যা করে। ভারতীয় পণ্য ব্যবহারের অপরাধে গণহত্যা করা হয় পঞ্চগড় সদর উপজেলার বানিয়াপাড়ায়। এই গণহত্যা স্থানীয় ইনসাফ নামে এক ব্যক্তিসহ বাইরের অনেক মানুষ মারা যায়। তাদের একজনে হাতে 'কমেড' কোম্পানির টর্চলাইট এবং অন্যান্যদের হাতে বেশকিছু ভারতীয় পণ্য পাওয়া তদেরকে হত্যা করা হয়।[১০৭]

১৯. পাকিস্তানি সৈন্যরা গেরিলা আক্রমণের ভয়ে সবসময় আতঙ্কিত থাকতেন। একারণে তাদের হাত থেকে রক্ষা পায় নি, ভিক্ষারি ও ফকিররাও। যখনই ভিন্ন বেশের কোনো মানুষ দেখতেন, তাদেরকে পাকিস্তানি সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধা বা গেরিলা ভেবে আক্রমণ করতেন। পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাড়িভাসা গণহত্যায় শহিদ হন দুইজন ভিক্ষারি। কারণ তাদের হাতে ছিলেন ভিক্ষার ঝুলি। পাকিস্তানি বাহিনী শংঙ্কিত ছিলেন ঝুলির মধ্যে অস্ত্র আছে, এই জন্য তাদেরকে গুলি করে হত্যা করেন।[১০৮] লালমনিরহাটের কুলাঘাট ইউনিয়নের ভাংগীর ব্রিজ গণহত্যায় ভিক্ষুক ধপকা মামুদকে হত্যা করা হয়।[১০৯]

২০. পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বাংলা ছিল শোষিত। শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করত। স্বাভাবিকভাবে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় শোষিতরা। ঔপনিবেশিক শক্তি অস্ত্র শক্তিতে ছিল বলিয়ান আর শোষিতরা জনশক্তিতে বেশি হওয়ায় উভয়ে তাদের শক্তির জায়গাকে কাজে লাগায়। ঔপনিবেশি শক্তি অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে এবং শোষিতরা তাই তাদের জনগণের সমর্থনকে কাজে লাগিয়ে

গেরিলা আক্রমণ করে। অর্থাৎ আতঙ্ক ছড়াও, ওৎ পেতে অপেক্ষা করো, নাকাল করো শত্রুকে, সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের চরমতম ক্ষিপ্রতা, অতর্কিতে আক্রমণ করেই তৎক্ষণাৎ লুকিয়ে পড়া ইত্যাদি। এটাই জনযুদ্ধ। জনযুদ্ধের উত্তর দেয় শোষিত শক্তিরা গণহত্যার মধ্য দিয়ে।[১১০] অধীনস্থ জনগণের বিদ্রোহে ঔপনিবেশিক শক্তির একটাই উত্তর— নিপীড়ন আর গণহত্যা।[১১১] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা-বিরোধী রণকৌশল দমনের একমাত্র নীতি হিসেবে পাকিস্তানি শোষকরা গ্রহণ করে সর্বাত্মক গণহত্যার মাধ্যমে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে গণহত্যা চালিয়েছিল গেরিলা যুদ্ধকে দমাবার জন্য। এর মাধ্যমে তারা বিশ্বব্যাপী তাদের প্রতিপক্ষদের এ মেসেজ দিতে চেয়েছিল বা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যে গেরিলা যুদ্ধ করে কোনো লাভ নেই।[১১২] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেও মার্কিন সরকার পাকিস্তানিদের সহায়তা করে গেরিলা যুদ্ধের বিপক্ষে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য।[১১৩]

২১. পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা সারাদেশে পূর্বশত্রুতা ও সম্পত্তি দখলের জন্যে অনেক গণহত্যা সংঘটিত করে। বিশেষ করে রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও শান্তি কমিটির লোকেরা পাকিস্তানি বাহিনীকে বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষের ওপর সম্পত্তির জন্য লেলিয়ে দেয়। নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার বাহাগীলি ইউনিয়নে পারিবারিক পূর্ব শত্রুতা ও জমি নিয়ে দ্বন্দ্বকে যুদ্ধের সময় কাজে লাগিয়ে ফায়দা তুলতে দেখা যায়। এরকম একটি ঘটনার প্রথম সূত্রপাত ঘটে টোরা সরদার ও শমসের সর্দার বাড়িতে। শমসের সর্দার পাকিস্তানি বাহিনীকে তার চাচার পেছনে লেলিয়ে দেন। তাদের খুঁজতে গিয়ে ৯ আষাঢ় রাত ২টার দিকে ক্যাপ্টেন জাবেদের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনারা দক্ষিণ বাহাগীলিতে অভিযান চালিয়ে অনেক মানুষকে গুলি করে হত্যা করে।[১১৪] ১৩ অক্টোবর বাগেরহাটের ফকিরহাটের রাজাকার লকপুর ইউনিয়নের ভট্টখামার গ্রামের নিরঞ্জন দাসের বিধবা স্ত্রী বিজনবালা দাসের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দখল করার জন্য পরিবারের তিনজনকে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে।[১১৫] সিলেটের জৈনপুর গণহত্যায় স্থানীয় রাজাকাররা সম্পত্তি দখল করার জন্য পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করে।[১১৬] সিলেট নয়াসড়কে অবস্থিত খাজাঞ্চিবাড়ি গণহত্যায় শহিদ হন নির্মল চৌধুরী। নির্মল চৌধুরীর সাথে তার ভাড়াটিয়ার ভাড়া নিয়ে মামলা চলছিল। সেই

ভাড়াটিয়া পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ে এসে তাকে হত্যা করে নেয়।[১১৭] এরকম অসংখ্য ঘটনা খুঁজে পাওয়া যাবে।

২২. বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের কাঠিরা গ্রামে একটি পরকীয়া প্রেমের সম্পর্কে জের ধরে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে প্রফুল্ল আরিন্দা পাকিস্তানে সেনাদের মিথ্যা তথ্য দিয়ে কাঠিরা গ্রামে গণহত্যা সংঘটিত করা হয়।[১১৮]

পাকিস্তানি বাহিনী যেসব গণহত্যা পরিচালনা করেছে তার সবই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মূল অংশ হিসেবে পরিচিত শত শত অধ্যাপক, চিকিৎসক ও শিক্ষককে[১১৯] একইভাবে সেনাবাহিনী কর্তৃক গৃহীত ভয়ংকর 'শুদ্ধি অভিযানের' মাধ্যমে বাঙালি যুব সম্প্রদায়ের সর্বোৎকৃষ্ট অংশকে খুঁজে বের করে শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর বাহিনী বাঙালিদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছিল তার প্রচুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। তবেই তরুণ প্রজন্ম বুঝতে পারবে কীভাবে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা বাঙালির ওপর নৃশংস অত্যাচার করেছিল। ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্যাতনের ভয়াবহতা বোঝা যায় ছোটন ডোমের বিবরণ থেকে। তিনি বলেছেন, '... আমরা শাঁখারীবাজারের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রবেশ করলাম–দেখলাম মানুষের লাশ, নারী, পুরুষ, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বালক, বালিকা, কিশোর, শিশুর বীভৎস পচা লাশ। চারদিকে ইমারত ভেঙে পড়ে আছে। মেয়েদের অধিকাংশ লাশ আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখলাম। দেখলাম তাদের বুক থেকে স্তন তুলে নেওয়া হয়েছে। কারো কারো যোনিপথে লাঠি ঢুকানো আছে। বহু পোড়া, ভস্ম লাশ দেখেছি।...'[১২০] বর্বরতা কতটা চরমরূপ ধারণ করলে নিষ্পাপ শিশুদেরও বিভৎসভাবে হত্যা করা হতে পারে তার উদাহরণ একাত্তর।

তথ্যসূত্র

১. শাহরিয়ার কবির, *একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১১

২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১২

৩. জাঁ পল সার্ত্রে, *গণহত্যা*, বাঙলায়ন, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১৫

৪. তপন পালিত, *লালমাটিয়া, জৈনপুর ও বাজাজি বাড়ি গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৪, পৃ. ১৪

৫. আহম্মেদ শরীফ, *গোলাহাট গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, মার্চ ২০১৫

৬. সুমা কর্মকার, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : নাটোর জেলা*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৬, পৃ. ২৫, ৩০, ৩১

৭. মো. মাহবুবর রহমান, 'সালামপুর গণহত্যা', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০২০, পৃ. ৩১

৮. মো. আব্দুস সালাম, 'পুলিশ লাইন গণহত্যা', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : ঠাকুরগাঁও জেলা*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ২২

৯. আলী ছায়েদ, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : পঞ্চগড় জেলা*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯

১০. আজহারুল আজাদ জুয়েল, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : লালমনিরহাট জেলা*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯

১১. সুমা কর্মকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫, ৩০, ৩১

১২. মামুন সিদ্দিকী, আহম্মেদ শরীফ, *গণহত্যা নির্ঘণ্ট ও জরিপ পরিচিতি*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ১৬

১৩. আহম্মেদ শরীফ, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : বগুড়া জেলা*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮, পৃ. ১০৩

১৪. *প্রাগুক্ত*

১৫. সেলিনা শিউলী, *বগুড়া জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৫

১৬. *ঐ;* আহম্মেদ শরীফ, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : বগুড়া জেলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

১৭. মিঠুন সাহা, *হাতিয়া গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৫

১৮. মো. রোকনুজ্জামান খান, *জগৎপুর গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৫

১৯. গৌরাঙ্গ নন্দী, *দেয়াড়া গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৫

২০. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

২১. মোতাহার হোসেন মাহবুব, *কৃষ্ণপুর-ধনঞ্জয় গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৫

২২. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *চুকনগর গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৫, পৃ. ১০

২৩. আহম্মেদ শরীফ, *কালিগঞ্জ গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৫

২৪. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*- দ্বিতীয় খণ্ড, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩৪৭

২৫. সুমা কর্মকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

২৬. আহম্মেদ শরীফ, *গোলাহাট গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৪

২৭. চৌধুরী শহীদ কাদের, *জগতমল্লপাড়া গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৫
২৮. আহম্মেদ শরীফ, *কাতুয়ার বিল গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৫
২৯. *প্রাগুক্ত*
৩০. http://www.thedailystar.net/bangla
৩১. সাক্ষাৎকারঃ মো. আবদুল মজিদ, উপজেলা মুক্তিযুদ্ধ কমান্ডার, দুপচাঁচিয়া, জেলাঃ বগুড়া, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান : নিজ বাসভবন, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২৬ মার্চ ২০১৪
৩২. মুনিরা জাহান সুমি, *কাঠিপাড়া গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৫
৩৩. বিষ্ণুপদ বাগচী, *ডাকরা গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৫
৩৪. আহম্মেদ শরীফ, *কালিগঞ্জ গণহত্যা*, *প্রাগুক্ত*
৩৫. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *চুকনগর গণহত্যা*, *প্রাগুক্ত*
৩৬. গৌরাঙ্গ নন্দী, *বাদামতলা গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৪
৩৭. মামুন সিদ্দিকী, *বেলতলী গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৪
৩৮. সাক্ষাৎকারঃ জেলু চন্দ্র, পিতা-লক্ষন চন্দ্র, গ্রামঃ পিরাইল, উপজেলাঃ কাহালু, জেলাঃ বগুড়া, তারিখঃ ২৫ জুলাই ২০১৭
৩৯. সাক্ষাৎকারঃ মো. রফিজ উদ্দীন, পিতা : নজের কাজী, নাশিরপাড়া, কাহালু, বগুড়া, তারিখঃ ২২ জুলাই ২০১৭
৪০. সাক্ষাৎকার : রজিব উদ্দিন, পিতা : আসতউল্লাহ, , গ্রামঃ জয়তুল, উপজেলাঃ কাহালু, জেলাঃ বগুড়া, তারিখঃ ২২ জুলাই ২০১৭; আব্দুস সামাদ, পিতাঃ আব্বাস মন্ডল, গ্রামঃ জয়তুল, উপজেলাঃ কাহালু, জেলাঃ বগুড়া, ২৫ জুলাই ২০১৭
৪১. এম এ হাসান, *৭১ এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ*, তাম্রলিপি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৭৬
৪২. শাহীন আলম, *চড়ারহাট গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৫
৪৩. আজহারুল আজাদ জুয়েল, *বহলা গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ২০১৫
৪৪. শাহীন আলম, *চড়ারহাট গণহত্যা*, *প্রাগুক্ত*
৪৫. আজহারুল আজাদ জুয়েল, *পশ্চিম রাজারামপুর গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৮
৪৬. আজহারুল আজাদ জুয়েল, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : লালমনিরহাট জেলা*, *প্রাগুক্ত*
৪৭. সুমা কর্মকার, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : নাটোর জেলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
৪৮. মামুন সিদ্দিকী, ১৯৭১ *কুমিল্লা পুলিশ লাইন*, বাংলাদেশ পুলিশ কুমিল্লা জেলা, ঢাকা, ২০১৮

৪৯. মামুন সিদ্দিকী, আহম্মেদ শরীফ, *গণহত্যা নির্ঘণ্ট পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-৪২

৫০. জয়দুল হোসেন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯

৫১. আজহারুল আজাদ জুয়েল, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : লালমনিরহাট জেলা*, প্রাগুক্ত

৫২. *প্রাগুক্ত*

৫৩. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ- দ্বিতীয় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৪

৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭২

৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯

৫৭. জয়দুল হোসেন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা*, *প্রাগুক্ত*

৫৮. মোজাম্মেল বিশ্বাস, 'উচিৎপুর গণহত্যা', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : দিনাজপুর জেলা*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ৯৬

৫৯. মামুন সিদ্দিকী, *মুক্তিযুদ্ধের অজানা ভাষ্য*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ ১৮৯

৬০. মামুন সিদ্দিকী, গবেষক, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : কুমিল্লা জেলা*, সাক্ষাৎকারের স্থান : বাংলা একাডেমি, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

৬১. সুমা কর্মকার, মুক্তিযুদ্ধে *নাটোর জেলা : পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও সহযোগীদের গণহত্যা এবং মানবতা বিরোধী অপরাধ*, (অপ্রকাশিত এমফিল থিসিস), ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭, পৃ. ৫০

৬২. চৌধুরী শহীদ কাদের, 'মহসিন কলেজ বধ্যভূমি', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : চট্টগ্রাম জেলা*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ৮৯-৯০

৬৩. মো. মাহবুবর রহমান, 'চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার শ্মশানঘাট গণহত্যা', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

৬৪. মোজাম্মেল বিশ্বাস, 'বাণীযোগী গণহত্যা', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : দিনাজপুর জেলা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

৬৫. আলী ছায়েদ, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : পঞ্চগড় জেলা*, *প্রাগুক্ত*

৬৬. সাক্ষাৎকার : রহিম মল্লিক, নীলফামারী পৌর, নীলফামারী, ২৬ মার্চ ২০১৩

৬৭. আহম্মেদ শরীফ, *গোলাহাট গণহত্যা*, *প্রাগুক্ত*

৬৮. চৌধুরী শহীদ কাদের, 'নাথপাড়া গণহত্যা', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : চট্টগ্রাম জেলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৩৭

৬৯. মোজাম্মেল বিশ্বাস, 'পুরাতন বাজার গণহত্যা', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : দিনাজপুর জেলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬-১০৭

৭০. দিব্যেন্দু দ্বীপ, 'রামপাল ডাকবাংলো বধ্যভূমি', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : বাগেরহাট জেলা*, (অপ্রকাশিত) ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা

৭১. চৌধুরী শহীদ কাদের, 'শেরশাহ কলোনী বধ্যভূমি ', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : চট্টগ্রাম জেলা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

৭২. চৌধুরী শহীদ কাদের, 'ইস্টার্ণ কেবলস বধ্যভূমি', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : চট্টগ্রাম জেলা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭
৭৩. সাহাদত পারভেজ, *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : মুন্সিগঞ্জ জেলা*, ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯, পৃ. ৭০
৭৪. মোজাম্মেল বিশ্বাস, 'ফুটকিবাড়ি গণহত্যা', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : দিনাজপুর জেলা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮-৭৯
৭৫. *প্রাগুক্ত*
৭৬. মোজাম্মেল বিশ্বাস, 'দেবীপুর গণহত্যা', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : দিনাজপুর জেলা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২
৭৭. মো. আব্দুস সালাম, 'ঠাকুরগাঁও সদর ইপিআর ক্যাম্প', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : ঠাকুরগাঁও জেলা, প্রাগুক্ত*, , পৃ. ২৬-২৭
৭৮. চৌধুরী শহীদ কাদের, 'ফয়েসলেক পশু খামার নির্যাতন কেন্দ্র', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : চট্টগ্রাম জেলা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩-১২৪
৭৯. চৌধুরী শহীদ কাদের, 'উত্তর কাট্টলী গোল্ডেন বেঙ্গল টোবাকো বধ্যভূমি', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : চট্টগ্রাম জেলা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬
৮০. মোজাম্মেল বিশ্বাস, 'কোতয়ালি থানা নির্যাতন কেন্দ্র', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : দিনাজপুর জেলা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২
৮১. মামুন সিদ্দিকী, *বেলতলী গণহত্যা, প্রাগুক্ত*
৮২. এম এ হাসান, *যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ*, ওয়ার ক্রাইমস্ ফ্যাক্টস্ ফাইন্ডিং কমিটি জেনোসাইড আর্কাইভ এন্ড হিউম্যান স্টাডিজ সেন্টার, লেখকের কথা
৮৩. *Sunday Times*, June 13, 1971
৮৪. *Daily New*, June 22, 1971
৮৫. জাঁ পল সার্ত্রে, *গণহত্যা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০
৮৬. জয়নুল হোসেন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা, প্রাগুক্ত*
৮৭. মামুন সিদ্দিকী, *বেলতলী গণহত্যা, প্রাগুক্ত*
৮৮. *দৈনিক খবর*, ২৪ অক্টোবর ২০০৪
৮৯. চৌধুরী শহীদ কাদের, *পাহাড়তলী গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ডিসেম্বর ২০১৪
৯০. মামুন সিদ্দিকী, *বেলতলী গণহত্যা, প্রাগুক্ত*
৯১. আহম্মেদ শরীফ, *বালারখাইল গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, মার্চ ২০১৫
৯২. আলী আকবর টাবী, *কল্যাণপুর গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, মার্চ ২০১৫
৯৩. দেলোয়ার হোসেন, *বড় রেলস্টেশন গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ডিসেম্বর ২০১৫
৯৪. মামুন সিদ্দিকী, *বেলতলী গণহত্যা, প্রাগুক্ত*
৯৫. চৌধুরী শহীদ কাদের, 'উত্তর কাট্টলী গোল্ডেন বেঙ্গল টোবাকো বধ্যভূমি', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : চট্টগ্রাম জেলা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬
৯৬. মো. নুর নবী, *গোপালপুর গণহত্যা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, মে ২০১৭, পৃ.৪২

৯৭. মোজাম্মেল বিশ্বাস, 'তিলাই রেলব্রিজ বধ্যভূমি', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : দিনাজপুর জেলা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫

৯৮. আহম্মেদ শরীফ, *১৯৭১ নীলফামারী : গণহত্যা ও নির্যাতন*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪২

৯৯. চৌধুরী শহীদ কাদের, 'ইস্টার্ন কেবলস বধ্যভূমি', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : চট্টগ্রাম জেলা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

১০০. সাহাদত পারভেজ, 'তালতলা ক্যাম্প গণহত্যা', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : মুন্সিগঞ্জ জেলা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১-৫৩

১০১. মোজাম্মেল বিশ্বাস, 'টেলিফোন ভবন গণহত্যা', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : দিনাজপুর জেলা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

১০২. মোজাম্মেল বিশ্বাস, 'বাসীযোগী গণহত্যা', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : দিনাজপুর জেলা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮

১০৩. মোজাম্মেল বিশ্বাস, 'পার্বতীপুর রেলস্টেশন গণহত্যা', *গণহত্যা-বধ্যভূমি, গণকবর জরিপ : দিনাজপুর জেলা, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৫

১০৪. মো. নুর নবী, *গোপালপুর গণহত্যা, প্রাগুক্ত*, পৃ.৪২

১০৫. মনিরুজ্জামান শাহীন, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : বরিশাল জেলা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা

১০৬. তপন পালিত, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : মৌলভীবাজার জেলা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা

১০৭. আলী ছায়েদ, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : পঞ্চগড় জেলা, প্রাগুক্ত*

১০৮. *প্রাগুক্ত*

১০৯. আজহারুল আজাদ জুয়েল, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ : লালমনিরহাট জেলা, প্রাগুক্ত*

১১০. জাঁ পল সার্ত্রে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬-১৭

১১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

১১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

১১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

১১৪. সাক্ষাৎকার: মকবুল হোসেন, নিতাই, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী, ৯ মে ২০১৩

১১৫. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ- দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৭

১১৬. তপন পালিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

১১৭. *প্রাগুক্ত*

১১৮. হিমু অধিকারী, *কাটিরা গণহত্যা*, ১৯৭১ : গণহত্যা ও নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, খুলনা, ডিসেম্বর ২০১৪

১১৯. অ্যান্থনী মাসকারেণহাস, *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ*, রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী (রনাত্রি) (অনূদিত), পপুলার পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১০৯

১২০. মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশ ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতনের রাজনীতি*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৭১